ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১২৬

৫ম প্রকাশ

মহররম	১৪২৫
ফাল্গুন	১৪১০
মার্চ	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

اسلام اور عدل اجتماعی -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAM-O-SAMAJIK SUBICHAR by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 5.00 Only.

পুস্তিকাখানার প্রবন্ধকার—১৯০৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যের আওরংগাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে সাড়ে চারশ' মাইল দূরে বাফেলো শহরে মিলার ফিলমোর হাসপাতালে সকাল পৌনে ন'টায়—পাকিস্তান সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা পৌনে ছ'টায় ৭৬ বছর বয়সে মাওলানা তাঁর প্রকৃত মা'বুদের সাথে মিলিত হন—ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

১৯৬২ সালের মক্কা-মুয়াজ্জমায় অনুষ্ঠিত রাবিতায়ে আলমে ইসলমীর প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মাওলানা এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আজীবন সদস্য নির্বাচিত হন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে সর্বোত্তম সৃজন কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন, তার একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই যে, সে সুস্পষ্ট ফেতনা-ফাসাদের প্রতি খুব কমই উদ্বুদ্ধ হয়। এ কারণেই শয়তান বাধ্য হয়ে ফেৎনা-ফাসাদকে (অনাচার-পাপাচার-বিদ্রোহ বিশৃংখলা) কল্যাণ ও মংগলের প্রতারণামূলক পোশাকে আচ্ছাদিত করে মানুষের সামনে উপস্থাপিত করে। বেহেশতে হযরত আদম (আ) এবং হযরত হাওয়া (আ)-কে শয়তান একথা বলে কিছুতেই প্রতারিত করতে পারতো না যে, 'আমি তোমার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী করাতে চাই যাতে করে তুমি বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হতে পার।'

প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাঁদেরকে একথা বলেই প্রতারিত করলো ঃ

يَا اٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَيَبْلٰى -

"হে আদম ! তোমাকে কি এমন গাছটি দেখিয়ে দিব যা তোমাকে চিরন্তন জীবন ও চিরস্থায়ী বাদশাহী দান করবে ?"

মানুষের এ প্রকৃতি আজো বিদ্যমান রয়েছে। আজও শয়তান মানুষকে যেসব ভুল-ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করছে, তা কোন না কোন প্রতারণামূলক শ্লোগান অথবা কোন না কোন ভণ্ডামির আবরণের মাধ্যমে গৃহীত হচ্ছে।

বর্তমানে সামাজিক সুবিচারের নামে যে প্রতারণার জালে মানুষকে আবদ্ধ করা হচ্ছে তার চেয়ে বড়ো প্রতারণা আর কিছু

হতে পারে না। শয়তান প্রথমত কিছুকাল যাবত দুনিয়াকে ব্যক্তি স্বাধীনতা (INDIVIDUAL LIBERTY) এবং উদারনীতির (LIBERALISM) নামে প্রতারণা করতে থাকে এবং তার ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন গণতন্ত্রের এক ব্যবস্থা কায়েম হয়। এক সময়ে এ ব্যবস্থার এমন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, পৃথিবীর বুকে সেটাকে মানবীয় উন্নতির চূড়ান্তরূপ মনে করা হতো। যে ব্যক্তি নিজেকে উন্নয়নকামী মনে করতো এমন প্রতিটি মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও উদারনীতির শ্লোগান দিতে বাধ্য হতো। মানুষ মনে করতো যে, মানব জীবনের জন্যে কোন ব্যবস্থা থাকলে তা শুধু এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং ধর্মহীন গণতন্ত্র যা পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দেখতে দেখতে সে সময়ও এসে গেল যখন সমগ্র দুনিয়া একথা অনুভব করতে লাগলো যে, এ শয়তানী ব্যবস্থা যুলুম-নির্যাতনে দুনিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। তারপর আর অভিশপ্ত শয়তানের পক্ষে সম্ভব ছিল না যে, এ শ্লোগান দ্বারা আর কিছুকাল মানবজাতিকে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে। অতএব অনতিবিলম্বে সে শয়তানই সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্রের নামে এক দ্বিতীয় প্রতারণা রচনা করে ফেললো। তারপর এ মিথ্যার আবরণে সে এক দ্বিতীয় ব্যবস্থা কায়েম করিয়ে দিল। এ নতুন ব্যবস্থাটি এ যাবত দুনিয়ার বিভিন্ন দেশকে নির্যাতন-নিষ্পেষণে এমনভাবে নিষ্পেষিত করে ফেলেছে যে, মানবীয় ইতিহাসে তার কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তার প্রতারণার এমন বিরাট প্রভাব যে, দুনিয়ার বহু দেশ তাকে চরম উন্নতি মনে করে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে। এ প্রতারণার জাল এখনো পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি।

মুসলমানদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে এক চিরন্তন পথনির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে যা

শয়তানী কুমন্ত্রণা ও ধোঁকা প্রবঞ্চনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার এবং জীবনের সার্বিক ব্যাপারে হেদায়াতের আলো দেখাবার জন্যে চিরকালের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এ হতভাগ্য ভিখারীর দল তাদের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উপনিবেসবাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার আগ্রাসনে পরাভূত। অতএব দুনিয়ার বিজয়ী জাতি-গুলোর ক্যাম্প থেকে যে শ্লোগানই ধ্বনিত হয়, সংগে সংগে এখান থেকেও তার প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। যে সময়ে ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারার প্রাধান্য চলছিল সে সময় মুসলিম দেশ- গুলোর প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি তার কর্তব্য মনে করতো সে চিন্তাধারা প্রচার করা এবং তদনুযায়ী নিজেকে ঢেলে সাজানো। সে মনে করতো এ ছাড়া তার কোন মানসম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তাকে মনে করা হবে প্রগতি বিরোধী। এ যুগের যখন অবসান ঘটলো তখন আমাদের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর কেবলাও পরিবর্তিত হতে লাগলো এবং নতুন যুগের আগমনের সাথে সাথেই আমাদের মধ্যে সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগানদাতা লোক পয়দা হতে লাগলো। এতটুকুতে তেমন কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর আবির্ভাবও হতে থাকে যারা তাদের কেবলা পরিবর্তনের সাথে সাথে এটাও চাইতো যে, ইসলাম তার কেবলা পরিবর্তন করুক। যেন মনে হয় এ বেচারাগণ ইসলাম ছাড়া জীবন ধারণ করতেই পারবে না। তাই ইসলামের সাথে থাকাই তাদের প্রয়োজন। কিন্তু তাদের বাসনা এই যে, যাদের আনুগত্যে তারা এ উন্নতি করতে চায় তার আনুগত্য ইসলামও করুক। এবং "পশ্চাদগামী দ্বীন" হওয়ার কলংক থেকে বেঁচে যাক। এর ভিত্তিতেই প্রথমে এ চেষ্টা চলতে থাকে যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা উদারনীতি এবং ধর্মহীন গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য ধারণাকে একেবারে ইসলামী বলে প্রমাণিত করা হোক

এবং এরই ভিত্তিতেই এখন প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে যে, ইসলামেও সমাজতান্ত্রিক ধারণা প্রসূত সামাজিক সুবিচার বিদ্যমান রয়েছে। এ পর্যন্ত পৌঁছুবার পর আমাদের উক্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিক গোলামী ও জাহেলিয়াতের প্লাবনজনিত লাঞ্ছনাও চরমে পৌঁছে।

আমি এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে একথা বলতে চাই যে, সামাজিক সুবিচার প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্তু এবং তা কায়েম করার সঠিক পন্থাই বা কি। যদিও এ ব্যাপারে খুব কমই আশা করা যায় যে, যারা সমাজতন্ত্রকে সামাজিক সুবিচারের একমাত্র উপায় মনে করে বসে আছেন তাঁরা তাঁদের ভুল স্বীকার করে নেবেন এবং এ নীতি পরিহার করবেন। কারণ অজ্ঞ যতক্ষণ নিছক অজ্ঞই থাকে, তখন তার সংশোধনের অনেকটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন সে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায় তখন সে বলে ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِىْ

"আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন শাসক আছে বলে আমার জানা নেই।"

তখন তার ঔদ্ধত্য ও গর্ব-অহংকার কারো কথায় তাকে সম্মত হতে দেয় না। কিন্তু আল্লাহর ফজলে সাধারণ জনগোষ্ঠী এমন রয়ে যায় যে ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে তাদেরকে বুঝানোর পর শয়তানের প্রতারণা থেকে সতর্ক করে দেয়া যেতে পারে। আর এ জনগোষ্ঠীকেই প্রতারণা করে পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী লোকেরা তাদের ভ্রান্ত প্রচারণার জাল বিস্তার করে। এ জন্যে আমার এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে আসল সত্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে কথাটি আমি আমার মুসলমান ভাইদেরকে বুঝাতে চাই তা হলো এই যে, যারা "ইসলামেও

সামাজিক সুবিচার বিদ্যমান রয়েছে”—একথা বলে, তারা ভুল কথা বলে। সত্য কথা এই যে, একমাত্র ইসলামেই সামাজিক সুবিচার রয়েছে। ইসলাম এমন এক সত্য দ্বীন তথা জীবনব্যবস্থা যা বিশ্ব স্রষ্টা ও বিশ্ব প্রভু মানুষের পথনির্দেশনার জন্যে নাযিল করেছেন। মানুষের মধ্যে সুবিচার কায়েম করা এবং কোন্‌টি সুবিচার ও কোন্‌টি সুবিচার নয়, একথা বলে দেয়া মানুষের স্রষ্টা ও প্রভুরই কাজ। অন্য কারো এ অধিকার ও যোগ্যতা নেই যে, সুবিচার ও যুলুম-অবিচারের মাপকাঠি ঠিক করে দেবে। অন্য কারো মধ্যে এ যোগ্যতাও নেই যে, সে প্রকৃত সুবিচার কায়েম করবে। মানুষ নিজে নিজেই প্রভু ও শাসক নয় যে, সে নিজের জন্যে সুবিচারের মাপকাঠি স্বয়ং নির্ধারণ করার কোন অধিকার রাখে। এ বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তার স্থান হচ্ছে আল্লাহর বান্দাহ ও প্রজার। সে জন্যে সুবিচারের মাপকাঠি নির্ণয় করা তার নিজের কাজ নয়, বরঞ্চ তার প্রভু ও শাসকের কাজ। তারপর মানুষ যতবড়ো মর্যাদাসম্পন্নই হোক না কেন এবং একজন মানুষই নয় বরঞ্চ বহু উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন মানুষ একত্রে সমবেত হয়ে তাদের মস্তিষ্ক চালনা করুক না কেন, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, মানবীয় জ্ঞান বিবেকের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মানবীয় বিবেকের উপর কামনা-বাসনা ও গোঁড়ামির প্রভাব থেকে তারা কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণে এমন কোন সম্ভাবনা নেই যে, মানুষ তার নিজের জন্যে এমন কোন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে যা প্রকৃতপক্ষে সুবিচার ভিত্তিক হবে। মানুষের রচিত ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম দৃশ্যত যেমন সুবিচারই চোখে পড়ুক না কেন, অতি সত্বর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দেয় যে, আসলে তার মধ্যে কোন সুবিচার নেই। এ কারণেই প্রতিটি মানব রচিত ব্যবস্থা কিছুকাল চলার পর ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়। মানুষ তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্য একটি অর্থহীন ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হয়। প্রকৃত সুবিচার

একমাত্র সে ব্যবস্থায় পাওয়া যেতে পারে, যা রচনা করেছেন এমন এক সত্তা যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন এবং যিনি সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতার উর্ধে।

দ্বিতীয় কথা যা শুরুতেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন তাহলো এই যে, যে ব্যক্তি 'ইসলামে সুবিচার আছে'—একথা বলে সে প্রকৃত সত্য কথা বলে না। প্রকৃত সত্য এই যে, সুবিচার করাই ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলাম এসেছেই এ জন্যে যে সুবিচার কায়েম করবে। আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ٥(الحديد : ٢٥)

"আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত সহ পাঠিয়েছি এবং সেই সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যাতে করে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং লোহাও অবতীর্ণ করেছি। এতে বিরাট শক্তি ও বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহ তায়ালা জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখেই তাঁর ও তাঁর রসূলগণের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিরাট শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।"

–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫)

এ দু'টি এমন বিষয় যে, তার থেকে যদি মুসলমান গাফেল না হয় তাহলে কখনো সামাজিক সুবিচার তালাশের জন্যে আল্লাহ ও

তাঁর রসূলকে ছেড়ে অন্য কোন উৎসের প্রতি মনোযোগ দেয়ার ভুল করবে না। যে মুহূর্তেই সে সুবিচারের প্রয়োজন অনুভব করবে সে মুহূর্তেই সে জানতে পারবে যে, ইনসাফ ও সুবিচার আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কারো কাছে নেই এবং থাকতে পারে না। সে এটাও জেনে নেবে যে, ইনসাফ কায়েম করার জন্যে এ ছাড়া আর কিছু করার নেই যে, ইসলাম—পরিপূর্ণ ইসলাম, অর্থাৎ শতকরা একশ' ভাগই ইসলাম কায়েম করতে হবে। ইনসাফ ইসলাম থেকে আলাদা কোন বস্তুর নাম নয়, ইসলাম স্বয়ং ইনসাফ। ইসলাম কায়েম হওয়া এবং ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম হওয়া একই বস্তু।

এখন আমাদের দেখা উচিত যে, সামাজিক সুবিচার আসলে কোন্ বস্তুটির নাম এবং তা প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থাই বা কি।

প্রতিটি মানব সমাজ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মানুষ নিয়েই গঠিত হয়। এ মানব সমষ্টির প্রতিটি মানুষ আত্মা, বিবেক ও অনুভূতি শক্তির অধিকারী প্রত্যেকের নিজস্ব এক স্থায়ী ব্যক্তিত্ব রয়েছে যার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধনের সুযোগ দরকার। প্রত্যেকের নিজস্ব রুচিবোধ রয়েছে, প্রত্যেকের মনের কামনা-বাসনা আছে। তার দেহ ও মনের কিছু প্রয়োজন আছে। এ ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা কোন মেশিনের প্রাণহীন অংশাবলীর মতো নয় যে, আসল বস্তু মেশিন এবং এ অংশগুলো সে মেশিনেরই বাঞ্ছিত বস্তুসমূহ—অংশগুলোর নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে, মানব সমাজ জীবন্ত জাগ্রত মানুষেরই এক সমষ্টি। এ ব্যক্তিবর্গ এ সমষ্টির জন্যে নয়, বরঞ্চ সমষ্টি ব্যক্তিবর্গের জন্যে। ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়ে এ সমষ্টি বা সমাজ এ উদ্দেশ্যেই গঠন করে যে, একে অপরের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের এবং দেহ ও মনের দাবী আদায়ের সুযোগ পাবে। অতপর এ ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই

পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। এ দুনিয়াতে প্রত্যেককেই একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষার সময় অতিক্রম করার পর আল্লাহর সামনে হাজীর হয়ে জবাব দিতে হবে যে, যে শক্তি ও যোগ্যতা দুনিয়াতে তাকে দেয়া হয়েছিল তার সুযোগ গ্রহণ করে এবং যেসব উপায়-উপকরণ তাকে দেয়া হয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করে সে কোন্ ব্যক্তিত্ব তৈরী করে এনেছে। আল্লাহর সামনে মানুষের এ জবাবদিহি সমষ্টিগতভাবে নয় ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে। সেখানে পরিবার, গোত্র এবং জাতি দাঁড়িয়ে দুনিয়ার কৃত-কর্মের হিসেব দেবে না, বরঞ্চ দুনিয়ার সকল সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিন্ন করার পর আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষকে আলাদা আলাদা তার আদালতে হাজীর করবেন এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞেস করবেন সে কি করে এসেছে এবং কি হয়ে এসেছে।

এ দু'টি বিষয় দুনিয়াতে মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আখেরাতে মানুষের জবাবদিহি একথারই দাবী করে যে, দুনিয়ায় মানুষের স্বাধীনতা থাকতে হবে। যদি কোন সমাজে ব্যক্তি তার ইচ্ছামত ব্যক্তিত্ব গঠনের সুযোগ না পায়, তাহলে তার মধ্যে মানবতা অসাড়-অবস হয়ে থাকবে। তার শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকবে, তার শক্তি ও যোগ্যতা দমিত হতে থাকবে এবং সে নিজেকে কারারুদ্ধ ও অবরুদ্ধ মনে করবে। এভাবে মানুষ জড়ত্বের শিকার হয়ে যায়। অতপর আখেরাতে এসব অবরুদ্ধ মানুষের দোষ-ত্রুটি দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে যারা এ ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা গঠন ও পরিচালনার জন্যে দায়ী। তাদের কাছে শুধু তাদের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডেরই হিসেব নেয়া হবে না, বরঞ্চ এ বিষয়েরও হিসেব নেয়া হবে যে, তারা একটা স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করে অন্যান্য অসংখ্য মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং নিজেদের মর্জি মতো অপদার্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে বাধ্য করেছে। একথা ঠিক যে আখেরাতের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসকারী ব্যক্তি এ

ভারী বোঝা বহন করে আল্লাহর কাছে হাজীর হওয়ার ধারণাও করতে পারে না। যদি সে আল্লাহকে ভয়কারী মানুষ হয়, তাহলে সে অবশ্যই মানুষকে যতবেশী সম্ভব স্বাধীনতা দানের প্রতিই আগ্রহশীল হবে যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছুই হবে আপন দায়িত্বেই হবে, যেন তার ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের জন্যে সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালকদের কোন দায়-দায়িত্ব বহন করতে না হয়।

এ হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। অন্য দিকে সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন যা পরিবার, গোত্র, জাতি এবং গোটা মানবতার আকারে ক্রমান্বয়ে কায়েম হয়। এবং সূচনা হয় একটি পুরুষ ও একটি নারী এবং তাদের সন্তান থেকে—যার থেকে পরিবার গঠিত হয়। এসব পরিবার থেকে গোত্র এবং জ্ঞাতীগোষ্ঠী তৈরী হয়। তার থেকে জাতি অস্তিত্ব লাভ করে। জাতি তার সামাজিক ইচ্ছা-অভিলাষ বাস্তবায়নের জন্যে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করে। বিভিন্ন আকারের এসব সামাজিক সামষ্টিক সংস্থাগুলো যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তাহলো তাদের সংরক্ষণ ও সাহায্যে ব্যক্তির স্বীয় ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সুযোগ করে দেয়া যা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিল এ ছাড়া হতে পারে না যতক্ষণ না এসবের প্রতিটি সংস্থা তার ব্যক্তিবর্গের উপর বড় সংস্থা ছোট সংস্থার উপর কর্তৃত্বশীল হয়েছে যাতে করে ব্যক্তিবর্গের এমন স্বাধীনতার প্রতিরোধ করতে পারে যা অপরের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে। সেই সাথে ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে এমন খেদমত নিতে পারে যা সামগ্রিকভাবে সমাজের সকল ব্যক্তির উন্নতি ও কল্যাণের জন্যে বাঞ্ছিত।

এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর সামাজিক সুবিচারের প্রশ্ন এসে যায়। একদিকে মানবীয় কল্যাণ দাবী করে যে, সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকতে হবে যাতে করে সে তার যোগ্যতা ও পসন্দ

অনুযায়ী স্বীয় ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারে। তেমনি পরিবার, গোত্র, জ্ঞাতীগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন দল ও বৃহত্তর পরিমণ্ডলের ভিতর থেকে সে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে যা আপন আপন পরিমণ্ডলে কাজ-কর্মের জন্যে আবশ্যক। কিন্তু অপরদিকে মানবীয় কল্যাণই একথার দাবী করে যে, ব্যক্তিবর্গের উপরে পরিবারের, পরিবারবর্গের উপরে গোত্রের ও জ্ঞাতীগোষ্ঠীর এবং সকল জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সংস্থাগুলোর উপরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকবে যাতে করে কেউ তার সীমালংঘন করে অপরের উপর যুলুম-অবিচার করতে না পারে। অতপর এ সমস্যা গোটা মানবতার জন্যেও সৃষ্টি হয় যে, একদিকে প্রত্যেক জাতি ও রাষ্ট্রেরও স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে এবং অপরদিকে কোন জাতির শক্তিশালী নিয়ম-নীতিও থাকতে হবে যেন এসব জাতি ও রাষ্ট্র সীমালংঘন করতে না পারে।

এখন সামাজিক সুবিচার যে বস্তুটির নাম তাহলো এই যে, ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, জ্ঞাতীগোষ্ঠী এবং জাতির মধ্যে প্রত্যেকের সংগত স্বাধীনতা থাকবে এবং সেই সাথে অবিচার-অনাচার প্রতিরোধের জন্যে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলোর ব্যক্তি ও একে অপরের উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি সামাজিক সংস্থাগুলো থেকে সে সব খেদমত হাসিল করবে যা সামাজিক সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে প্রয়োজন।

এ সত্য ও বাস্তবতাকে যে ব্যক্তি ভালভাবে উপলব্ধি করবে সে প্রথমেই একথা জেনে নেবে যে, যেভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদারনীতি (Liberalism), পুঁজিবাদ এবং ধর্মহীন গণতন্ত্রের সে ব্যবস্থা সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থী ছিল যা ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠিক তেমনি, বরঞ্চ তার চেয়ে অধিকতর পরিপন্থী সে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা কার্লমার্কস ও এঞ্জেলসের মতবাদের অনুসরণে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রথম ব্যবস্থাটির

ক্রটি এই ছিল যে, তা ব্যক্তিকে সীমাতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে পরিবার, গোত্র, সমাজ ও জাতির উপর যুলুম-নিষ্পেষণ করার পূর্ণ লাইসেন্স দিয়েছিল এবং সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে সমাজের কাজ করার শক্তি শিথিল করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির ক্রটি এই যে, রাষ্ট্রকে সীমাহীন ক্ষমতা দান করে ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র ও সমাজের স্বাধীনতা প্রায় একেবার খতম করে দিয়েছে। তারপর ব্যক্তিবর্গ থেকে সমষ্টির কাজ নেয়ার জন্যে রাষ্ট্রকে এতবেশী কর্তৃত্ব প্রভুত্ব দান করে যে ব্যক্তি সত্তার অধিকারী মানুষের পরিবর্তে একটি মেশিনের প্রাণহীন যন্ত্রাংশের রূপ ধারণ করে। যে একথা বলে যে, এ ব্যবস্থার দ্বারা সামাজিক সুবিচার কায়েম হতে পারে, তার কথা একেবারে সত্যের অপলাপ। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অন্যায় অবিচারের এ এক অতি নিকৃষ্ট রূপ যার দৃষ্টান্ত কোন নমরূদ, ফেরাউন ও চেংগিজখানের শাসন কালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক বা একাধিক ব্যক্তি বসে একটি সামাজিক দর্শন রচনা করলো। তারপর সরকারের সীমাহীন এখতিয়ারের বদৌলতে এ দর্শনকে অন্যায়ভাবে একটি দেশে বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দিল। মানুষের ধন-সম্পদ কেড়ে নিল। জমি-জমা, ক্ষেত-খামার হস্তগত করলো। কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করলো। গোটা দেশকে এমন এক জেলখানায় পরিণত করলো যে, সমালোচনা, বিচার প্রার্থনা, অভিযোগ, মামলা দায়ের প্রভৃতি কাজ করার এবং বিচার বিভাগীয় সুবিচারের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। দেশে কোন দল থাকবে না, কোন সংগঠন থাকবে না, কোন প্লাটফরম থাকবে না—যেখান থেকে মানুষ তাদের মুখ খুলতে পারে ; কোন প্রেস থাকবে না—যার সাহায্যে মানুষ তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে ; কোন বিচারালয় থাকবে না—যার দুয়ারে সুবিচারের জন্যে মানুষ ধরণা দিতে পারে।

গোয়েন্দা সংস্থার কাজ সেখানে এতো ব্যাপক যে, প্রতিটি মানুষ অন্য একটি মানুষকে ভয় করে যে, কি জানি হয়তো সে একজন গুপ্তচর। এমনকি আপন গৃহে কথা বলার সময়ও একজন চারদিকে তাকিয়ে দেখে যে কোন কান তার কথা শুনার জন্যে এবং কোন ব্যক্তি সে কথা সরকারের কাছে পৌঁছাবার জন্যে সেখানে আছে নাকি। তারপর গণতন্ত্রের প্রবঞ্চনা দিয়ে সেখানে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়, যাতে করে এ দর্শনের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী কোন ব্যক্তি এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে। আর এমন কোন ব্যক্তি যেন এতে হস্তপেক্ষ করতে না পারে যে নিজস্ব কোন মতবাদ পোষণ করে এবং যে নিজের বিবেক বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়। কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কি একে সামাজিক সুবিচার বলে আখ্যায়িত করবে ?

যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ পদ্ধতিতে ধন-সম্পদের সমবন্টন হতে পারে, অথচ আজ পর্যন্ত কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা করতে পারেনি, তথাপি সুবিচার কি শুধু অর্থনৈতিক সমতার নাম ? আমি একথা জিজ্ঞেস করি না যে, এ ব্যবস্থার এক নায়ক এবং এ ব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী একজন কৃষকের জীবনের মান এক কি না। আমি শুধু এতোটুকু জানতে চাই যে, তাদের সকলের মধ্যে সত্যিই যদি পুরোপুরি অর্থনৈতিক সাম্য কায়েম হয়েও থাকে, তাহলে এর নাম কি সামাজিক সুবিচার ? সুবিচার কি এই যে, ডিক্টেটর ও তাঁর সংগী-সাথী যে দর্শন উদ্ভাবন করেছে, পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং গুপ্তচর ব্যবহার শক্তির দ্বারা তা বল পূর্বক গোটা জাতির উপর চাপিয়ে দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এ দর্শনের এবং তা কার্যকর করার কোন ছোট-খাটো কার্যক্রমের বিরুদ্ধেও কোন ব্যক্তির টুশব্দ করার স্বাধীনতা থাকবে না ? এ কি সুবিচার যে, ডিকটেটর ও তার মুষ্টিমেয় অনুসারী তাদের দর্শন

কার্যকর করার জন্যে সমগ্র দেশের উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার এবং সকল প্রকার সংগঠন করার অধিকারী। কিন্তু তাদের থেকে ভিন্নমত পোষণকারী দুই ব্যক্তি মিলেও কোন সংগঠন করার অধিকারী নয় ? এটা কি সুবিচার যে, সকল জমির মালিক ও কল-কারখানার মালিকদেরকে বেদখল করে সমগ্র দেশে শুধুমাত্র একজন জমিদার ও একজন কারখানার মালিক থাকবে যার নাম সরকার ? আর সে সরকারের সর্বময় ক্ষমতা থাকবে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ? এসব লোক এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার কারণে গোটা জাতি একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাত থেকে অন্য কারো হাতে হস্তান্তরিত হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে যাবে ? মানুষ যদি নিছক পেটের নাম না হয় এবং মানব জীবন যদি শুধু জীবন জীবিকায় সীমিত না হয়, তাহলে নিছক অর্থনৈতিক সাম্যকে কি করে সুবিচার বলা যেতে পারে ? জীবনের প্রতিটি বিভাগে অত্যাচার-নিপীড়ন কায়েম করে এবং মানবতার প্রতিটি দিক দাবিয়ে রেখে শুধু ধন-দৌলতের বন্টনে যদি মানুষকে সমানও করে দেয়া যায় এবং স্বয়ং ডিকটেটর ও তার সহচরগণও যদি নিজেদের জীবনের মান অন্যান্য লোকের সমান করে নেয়, তথাপি বিরাট যুলুমের মাধ্যমে এ সাম্য কায়েম করাকে সামাজিক সুবিচার বলা যেতে পারে না। বরঞ্চ, যেমন আমি একটু আগে বলেছি, এ হচ্ছে অতীব নিকৃষ্ট সামাজিক যুলুম-অবিচার, যার সাথে মানব ইতিহাস ইতিপূর্বে পরিচিত হয়নি।

এখন আমি সংক্ষেপে বলতে চাই যে, ইসলাম যে সুবিচারের নাম তা কি ? ইসলামে এ বিষয়ের কোন অবকাশ নেই যে, কোন ব্যক্তি বা কোন দল মানব জীবনে সুবিচারের কোন দর্শন ও তা প্রতিষ্ঠার কোন পন্থা-পদ্ধতি নিজেরা বসে ঠিক করবে এবং তা বলপূর্বক মানুষের উপর চাপিয়ে দেবে, অথচ কেউ যেন তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না পারে।

এ অধিকার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমর ফারুক (রা) কেন, স্বয়ং মুহাম্মাদ (সা)-এরও ছিল না। ইসলামে কোন ডিকটেটরের স্থান নেই। শুধু এ মর্যাদা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালারই রয়েছে যে, মানুষ বিনা দ্বিধায় তাঁর আনুগত্যে নতশির হবে। নবী মুহাম্মাদ (সা) স্বয়ং তাঁর আদেশ নতশিরে মেনে চলেছেন এবং তাঁর রসূলের আদেশ পালন এ জন্যে ফরয বা অপরিহার্য ছিল যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দিতেন। মায়াযাল্লাহ্, তিনি স্বকপোলকল্পিত কোন দর্শন আবিষ্কার করেননি। রসূল এবং তার খলিফাদের শাসন ব্যবস্থায় শুধু শরীয়াতে এলাহীয়া সমালোচনার ঊর্ধে ছিল। তাছাড়া প্রত্যেকের সকল অবস্থায় কথা বলার পূর্ণ অধিকার ছিল।

ইসলামে আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং সে সীমারেখা নির্ধারিত করে দিয়েছেন—যার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমিত থাকা উচিত। তিনি স্বয়ং এটাও নির্ধারিত করে দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানের জন্যে কোন্ কোন্ জিনিস নিষিদ্ধ যার থেকে তার দূরে থাকা উচিত এবং কি কি ফরয যা অবশ্যই পালন করতে হবে। অপরের উপরে তার কি অধিকার এবং তার উপরে অপরের কি অধিকার, কোন্ উপায় ও পদ্ধতিতে কোন সম্পদের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তরিত হওয়া বৈধ এবং এমন কি কি উপায় পদ্ধতি আছে যার দ্বারা লব্ধ সম্পদের মালিকানা বৈধ নয়, মানুষের মংগলের জন্যে সমষ্টির কি দায়-দায়িত্ব এবং সমষ্টির মংগলের জন্যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও গোটা জাতির উপর কি কি বাধা-নিষেধ আরোপিত হতে পারে এবং কি খেদমত অপরিহার্য করা যেতে পারে—এসব কিছুই কুরআন ও সুন্নাহর এমন এক চিরস্থায়ী সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে যা পুনঃ পরীক্ষা করার কেউ নেই এবং যা পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অধিকার কারো নেই।

এ সংবিধান অনুযায়ী এক ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরে যে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তা লংঘন করার যেমন তার কোন অধিকার নেই, তেমনি যেসব সীমারেখার ভেতর তার যে স্বাধীনতা রয়েছে তা হরণ করার অধিকারও কারো নেই। সম্পদ অর্জনের যে উপায়-পদ্ধতি এবং তা ব্যয় করার যে পন্থা হারাম করা হয়েছে তার নিকটবর্তীও সে হতে পারে না। উভয় ব্যাপারেই হারাম পন্থা অবলম্বন করলে ইসলামী আইন তাকে শাস্তির যোগ্য মনে করবে। কিন্তু যেসব পন্থা-পদ্ধতি হালাল করা হয়েছে তার দ্বারা অর্জিত সম্পদের মালিকানার উপর তার অধিকার একেবারে সংরক্ষিত এবং এ সম্পদ ব্যয়ের যে পন্থা জায়েয করা হয়েছে তার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

এমনিভাবে সমষ্টির কল্যাণের জন্যে যেসব দায়িত্ব ব্যক্তিবর্গের উপর আরোপিত করা হয়েছে, তা পালন করার জন্যে তো তারা বাধ্য। কিন্তু তার অধিক কোন বোঝা তাদের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। তবে হা, স্বয়ং ইচ্ছা করে তারা তা করতে পারে। এ অবস্থা সমষ্টি এবং রাষ্ট্রেরও। ব্যক্তিবর্গের যে সমস্ত অধিকার তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে, তা পালন করা তাদের জন্যে তেমনই অপরিহার্য যেমন ব্যক্তিবর্গ থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করার এখতিয়ার তাদের আছে। এ চিরস্থায়ী ও চিরকালীন সংবিধানকে যদি বাস্তবে কার্যকর করে দেয়া যায় তাহলে এমন পরিপূর্ণ সামাজিক সুবিচার কায়েম হয় যার পর আর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। এ সংবিধান যতদিন বিদ্যমান রয়েছে ততদিন পর্যন্ত কেউ যতোই চেষ্টা করুক না কেন, সে মুসলমানদেরকে এ ধোঁকা দিতে পারে না যে, অন্য কোথাও থেকে ধার করে আনা সমাজতন্ত্রই ইসলাম।

ইসলামের এ সংবিধানে ব্যাষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এমন ভারসাম্য কায়েম করা হয়েছে যে, ব্যক্তিকে না এমন স্বাধীনতা

দেয়া হয়েছে যে সে সমষ্টির স্বার্থে কোন আঘাত হানতে পারে, আর না সমষ্টিকে এমন কোন এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে তারা ব্যক্তির সে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে। যা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভের জন্যে প্রয়োজনীয়। ইসলাম একজন ব্যক্তির সম্পদ লাভের তিনটি পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছে। এক—উত্তরাধিকার, দুই—উপার্জন, তিন—হেবা বা দান। উত্তরাধিকার তাই নির্ভরযোগ্য যা সম্পদের বৈধ মালিকের নিকট থেকে তার উত্তরাধিকারীর নিকটে শরীয়াত মুতাবিক তার কাছে পৌঁছেছে। হেবা বা দান শুধু তাই নির্ভরযোগ্য যা সম্পদের বৈধ মালিক শরীয়াতের সীমারেখার মধ্যে থেকে দিয়েছে। যদি এ দান কোন সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা সেই অবস্থায় বৈধ হবে যদি তা কোন সঠিক খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ অথবা জনগণের কল্যাণে সরকারী মালিকানা থেকে সঠিক ও ন্যায়সংগত পন্থায় দেয়া হয়ে থাকে। উপরন্তু এ ধরনের দান করার অধিকার সেই সরকার যা শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত এবং যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্ণ অধিকার জাতির থাকবে।

এখন রইলো জীবিকার বিষয়। তো সেই জীবিকাই বৈধ যা হারাম উপায়ে অর্জিত নয়। চুরি, আত্মসাৎ, মাপে কম-বেশী করা, বলপূর্বক হস্তগত করা। সুদ-ঘুষ, ব্যভিচার বৃত্তি, মওজুদদারি, জুয়া, প্রতারণামূলক সওদা, মাদক দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অশ্লীলতা প্রচারণার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন ইসলামে হারাম। এসব সীমারেখার মধ্যে যে সম্পদ অর্জন করবে সে তার বৈধ মালিক হবে। তা বেশী হোক বা কম হোক তাতে কিছু যায় আসে না। এ ধরনের মালিকানার জন্যে কমবেশী করার কোন সীমারেখা নির্ধারণ করা যেতে পারে না। কম হওয়া এটা বৈধ করে দেয় না যে, অপরের সম্পদ কেড়ে তা বেশী করা যাবে। তার বেশী হওয়াও এ অনুমতি দেয় না যে বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে কম করা হবে। অবশ্যি

যে সম্পদ এ বৈধ সীমারেখা লংঘন করে অর্জিত হবে সে সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা মুসলমানদের অধিকার থাকবে যে, সে কিভাবে কোথা থেকে অর্জন করেছে। এ ধরনের সম্পদ সম্পর্কে আইনানুগ তদন্ত হওয়া উচিত। যদি প্রমাণিত হয় যে, তা অবৈধ উপায়ে অর্জন করা হয়েছে তাহলে তা বাজেয়াপ্ত করার পূর্ণ অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের থাকবে।

বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করারও লাগামহীন স্বাধীনতা মালিককে দেয়া হয়নি। বরঞ্চ তার জন্যে কিছু আইনগত বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যাতে করে তা এমন পন্থায় ব্যয় করা না হয় যা সমাজের জন্যে ক্ষতিকর হয় অথবা স্বয়ং সে ব্যক্তির দ্বীন ও চরিত্রের দিক দিয়ে ক্ষতিকর হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি তার সম্পদ পাপাচারের জন্যে ব্যয় করতে পারবে না। মদ্যপান ও জুয়ার দ্বার তার জন্যে রুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যভিচারের দ্বারও বন্ধ করা হয়েছে। মুক্তস্বাধীন মানুষকে ধরে এনে দাসদাসী বানাবার এবং তাদের কেনা-বেচার এমন অধিকারও ইসলাম দেয় না যে, কোন ধনশালী ব্যক্তি খরিদ করা দাসদাসী দিয়ে তার গৃহপূর্ণ করবে। ব্যয় বাহুল্য এবং সীমাতিরিক্ত বিলাসিতা করার উপরেও ইসলাম বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে। ইসলাম এ বিষয়েরও অনুমতি দেয় না যে, এক ব্যক্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবে এবং তার প্রতিবেশী ভুখা থাকবে। ইসলাম শুধুমাত্র শরীয়াতসম্মত পন্থায় ধন-সম্পদ উপভোগ করার অধিকার দেয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকে অধিকতর সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহার করতে চাইলে উপার্জনের শুধু বৈধ পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। শরীয়াত উপার্জনের যে সীমারেখা নির্ধারিত করে দিয়েছে তা কিছুতেই লংঘন করা যাবে না।

তারপর সমাজ সেবার জন্য ইসলাম সেই ব্যক্তির উপর যাকাত অপরিহার্য করেছে যার কাছে নেসাবের অতিরিক্ত সম্পদ

থাকবে। উপরন্তু ব্যবসার মালের উপর, জমির উৎপন্ন ফসলের উপর, গবাদি পশুর উপর এবং অন্যান্য সম্পদের উপরেও এক বিশিষ্ট পরিমাণে যাকাত ফরয করা হয়েছে।

দুনিয়াতে যে কোন দেশে যদি শরীয়াতের বিধি-বিধান অনুযায়ী রীতিমত যাকাত আদায় করা হয় এবং কুরআনের নির্দিষ্ট খাত অনুযায়ী ব্যয় করা হয়, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানে কোন ব্যক্তি কি অভাবগ্রস্ত থাকতে পারে এবং জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে ?

তারপর যে সম্পদ কোন ব্যক্তির কাছে পুঞ্জিত রয়ে যাবে, তার মৃত্যুর সাথে সাথেই ইসলাম সে সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করে দেবে যাতে করে এ পুঞ্জিত সম্পদ স্থায়ীভাবে পুঞ্জিত হয়ে থাকতে না পারে।

উপরন্তু ইসলাম চায় যে জমির মালিক ও ক্ষেতমুজুরের মধ্যে, কল-কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে ন্যায়সংগত পন্থায় কায়কারবার স্থিরীকৃত হোক এবং আইনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন না হোক। কিন্তু এ ব্যাপারে কোথাও যদি অন্যায়-অবিচার হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং আইনের মাধ্যমে সুবিচারের সীমারেখা নির্ধারিত করে দেবে।

ইসলাম সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করাকে অবৈধ মনে করে না। যদি কোন ব্যবসা অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠান জনস্বার্থে প্রয়োজন কিন্তু কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তা চালাতে প্রস্তুত নয়, অথবা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা বেসরকারীভাবে পরিচালিত হলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়, তাহলে তা সরকারের পরিচালনাধীনে নিয়ে যেতে পারে।

এমনিভাবে যদি শিল্প-কারখানা অথবা ব্যবসা কিছু লোকের দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত হয় যে, জনস্বার্থের দিক দিয়ে তা ক্ষতিকর, তাহলে সরকার ঐসব লোককে পারিশ্রমিক দিয়ে ব্যবসাটি নিজের তত্ত্বাবধানে নিতে পারে এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে তা চালাবার ব্যবস্থা করতে পারে। এমন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনে শরীয়াত কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না। কিন্তু ইসলাম একটা নীতি হিসেবে এ বিষয় মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে, পণ্য উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণ সরকারের মালিকানাধীন হবে এবং সরকারই দেশের একমাত্র শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং জমি-জমার মালিক হবে।

বায়তুলমাল (রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদ) সম্পর্কে ইসলামের অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত এই যে, তা আল্লাহ এবং মুসলমানদের সম্পদ এবং তার উপরে অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানা অধিকার নেই। মুসলমানদের অন্যান্য সমগ্র বিষয়াদির ন্যায় বায়তুলমালের ব্যবস্থাপনা জাতি অথবা তাদের স্বাধীন প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শে চলবে। যার নিকট থেকেই কিছু নেয়া হবে এবং যে খাতেই সম্পদ ব্যয় করা হবে তার জায়েয পদ্ধতিতেই হতে হবে। এ বিষয়ে মুসলমানদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

পরিশেষে আমি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে এ প্রশ্ন রাখতে চাই যে, সামাজিক সুবিচার যদি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সুবিচারের নাম হয়, তাহলে যে অর্থনৈতিক সুবিচার ইসলাম কায়েম করে তা কি আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এরপরে আর কি কোন প্রয়োজন আছে যার জন্যে সকল মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হবে, লোকের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সমগ্র জাতিকে গুটিকয়েক লোকের গোলাম বানিয়ে দেয়া হবে? শেষ পর্যন্ত কোন্ বস্তু এ বিষয়ের প্রতিবন্ধক যে, আমরা মুসলমান,

আমাদের দেশে ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী খাঁটি শরীয়াতের শাসন কায়েম করি এবং আল্লাহর শরীয়াত সেখানে পুরোপুরি কায়েম করে দেই। যে দিনই আমরা তা করব, সেদিন শুধু যে সমাজতন্ত্র থেকে প্রেরণা লাভের কোন প্রয়োজন হবে না তাই নয়, বরঞ্চ সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষও আমাদের জীবনব্যবস্থা দেখে অনুভব করবে যে, যে আলোকের অভাবে তারা অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, সে আলোক তাদের চোখের সামনেই রয়েছে।